Vol. 41 | No. 2 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

পালি ছন্দ

Volume	41
Issue	2
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সুকোমল বড়ুয়া, সুমন কান্তি বড়ুয়া
Published online	February 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i2.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i2.5
Pages	126-151
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

পালি ছন্দ

সুকোমল বড়ুয়া*

সুমন কান্তি বড়ুয়া**

Check for updates

পালিভাষা সাহিত্যের ভাষা[১]। অন্যান্য ভাষার মত এ ভাষাও সূচনালগ্নে কথ্য ভাষারূপে বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে পবিত্র ত্রিপিটক তো বটেই, এমনকি ত্রিপিটকের অন্তর্গত বিভিন্ন অট্ঠকথা ও টীকা-টিপ্পনীসহ নানা গ্রন্থ এ ভাষায় লিখিত হয়েছে। যেহেতু এটা বুদ্ধবচন, সেহেতু এ ভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল অনেক বেশী। বুদ্ধ পরবর্তীকালে এ বিষয়টি আরো গভীরভাবে অনুভূত হয়। তাইতো দু'হাজার বছরেরও অধিক কাল ধরে এ ভাষায় পঠন-পাঠন, চর্চা-অনুশীলন ও পণ্ডিতদের গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। এককথায় এ ভাষায় বৌদ্ধ শাস্ত্রীয় অমূল্য গ্রন্থসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে, এবং এর সারবত্তা বিভিন্ন ভাবধারায় প্রকাশ পেয়েছে[২]। বলাবাহুল্য, মহামানব গৌতম বুদ্ধই প্রথমে এভাষার প্রসার সাধন করেন। তাই ত্রিপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থগুলোর গুরুত্ব এক্ষেত্রে সর্বাধিক। কারণ বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের পরিব্যাপ্তির ব্যাপকতার জন্যই মূলত পালিভাষা ও সাহিত্য অমরত্ব লাভ করেছে।

গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল খ্রি. পূ. ছয় শতকে। তিনি রাজপুত্র ছিলেন। তাঁর পৈত্রিক রাজত্বস্থল ছিল হিমালয়ের পাদদেশস্থ শাক্যরাজ্য। পরিবারে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ-গৌতম। ঊনত্রিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন। অভীপ্সা হল নিজের ও সর্বপ্রাণীর দুঃখ মুক্তির পথ অনুসন্ধান করা। এজন্য বহু জনপদ ও অরণ্য পরিভ্রমণ করেছিলেন। দ্বারস্থ হয়েছিলেন স্বনামখ্যাত বহু ঋষি-মনীষীর নিকট। কিন্তু লক্ষ্য অর্জনযোগ্য সদর্থক নির্দেশনা কোথাও পাননি। পরিশেষে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উরুবেলায় (বর্তমান ভারতের বিহার প্রদেশের গয়া জেলায়) গিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। অতঃপর পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তখন হতে তিনি পরিচিতি লাভ করেন 'গৌতম বুদ্ধ' নামে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

** এম, ফিল গবেষক, পালি, সংস্কৃত ও পালি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

১ মুরারি মোহন সেন, *ভাষার ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯১, পৃ. ৪

২ বংশদীপ মহাস্থবির, *কচ্চায়ন ব্যাকরণ* (অনূদিত), কলিকাতা, ১৯৪০, পৃ. ১ (ভূমিকা)।

গৌতম বুদ্ধ তাঁর আত্মস্থ অভিজ্ঞতা ও অর্জিত সত্য প্রকাশ করলেন পালিভাষায়। পালি হল সেই সময়কার ভারতবর্ষে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষার বিভিন্ন রূপের সংমিশ্রণে গঠিত ভাষা[৩]। তখন প্রাকৃত ভাষা ছিল সচল ভাষা, বহু লোকের ব্যবহারিক ভাষা। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা এই প্রাকৃত ভাষাতেই কথা বলতেন। যদিও অঞ্চল ভিত্তিক এর কিছুটা পরিবর্তিত রূপও ছিল। ভাষা সাহিত্যের গবেষক শ্রীমুরারি মোহন সেন ভাষাতাত্ত্বিক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডক্টর সুকুমার সেনের উদ্ধৃতি টেনে বলেছেন – বৈদিক কথ্যভাষার উপাদান হতেই পালিভাষার সৃষ্টি।[৪] এখানে বৈদিক কথ্যভাষার উপাদান বলতে প্রকৃত পক্ষে প্রাকৃত ভাষাকেই বোঝানো হয়েছে। প্রাকৃত থেকে উদ্ভূত হলেও ক্রমে পালি একটি স্বতন্ত্র ভাষার মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ভারতবর্ষে পালিভাষা প্রথম হতেই সফলতার সাথে প্রসার লাভ করে। বিকাশের উৎসমূলে এটি ছিল কথ্যভাষা।[৫] বুদ্ধ উত্তরকালে এটি সাহিত্যের ভাষারূপেই সর্বাধিক পরিচিতি লাভ করে। খ্রি. পূ. ছয় শতক থেকে খ্রিস্টীয় পাঁচ শতক পর্যন্ত সময়ে পালি সাহিত্যের বেগবান ক্রমবিকাশ লক্ষণীয়। কালাতিক্রমের স্রোত ধারায় প্রাকৃতের মত পালি তেমন পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় নি। খ্রি. পূ. তিন শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় এ ভাষা ও সাহিত্য বহুলাংশে নতুনধারায় সুসমৃদ্ধ হয়েছিল। এ সময় বৌদ্ধ শাস্ত্র ত্রিপিটকের বিস্তার ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিল। ভারতবর্ষের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রসমূহ ছাড়াও সিরিয়া, মিশর, আফ্রিকা, ইউরোপেও তখন বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করেছিল[৬]।

পালি সাহিত্যে ছন্দের গুরুত্ব ঃ প্রথমেই বলেছি, পালি সাহিত্যের আকর হল ত্রিপিটক। ত্রিপিটক একাই একটি সাহিত্য পারিবার যাকে অন্য কথায় বলা যায় সাহিত্য ভাণ্ডার। কারণ ত্রি-পিটক[৭] বলতে যে তিনটি পিটককে বোঝানো হয় তার অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থের সংখ্যা একত্রিশটি। স্বতন্ত্র নামের ভিত্তিতে এ সংখ্যা নিরূপণ করা হল।

---

৩ বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস*, কলিকাতা, পৃ. ৩ (মুখবন্ধ)।

৪ মুরারি মোহন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১

৫ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ. ৭

৬ সুনীল চট্টোপাধ্যায়, *প্রাচীন ভারতের ইতিহাস*, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২২১

৭ বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটকের সমন্বিত নাম 'ত্রিপিটক'।

কিন্তু গ্রন্থের সংখ্যা নির্ধারণ করলে দাঁড়ায় প্রায় বাহান্নটি। কারণ অনেক গ্রন্থের বিষয়বস্তু সমাপ্ত হয়েছে তিন থেকে পাঁচ খণ্ডে। কোন খণ্ডেরই বিস্তারের পরিসর যৎসামান্য নয়। এ বিপুল বৈভবসম্পন্ন ত্রিপিটককে বুদ্ধ নয় ভাগে ভাগ করেছিলেন। এ নয় ভাগকে একত্রে 'নবাঙ্গসত্থুসাসন' বলা হয়। 'নবাঙ্গসত্থুসান' শব্দের অর্থ হল - শাস্ত্র বা গুরুর সাসন নয় ভাগে বিভক্ত।[৮]

এগুলো হল-সূত্র, গেয়্য, ব্যাকরণ, গাথা, উদান, ইত্যুক্তক, জাতক, অদ্ভুতধর্ম ও বেদল্য। এই নয়টি অঙ্গের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হল নিম্নরূপ ঃ

সূত্র ঃ গদ্যাশ্রিত বিবরণমূলক বুদ্ধবচন। তবে কিছু কিছু সূত্রের নিদান কথা[৯], এবং খুদ্দক নিকায়ের[১০] প্রায় সব সূত্রগুলোই পদ্যাশ্রিত। কিন্তু এখানে সাহিত্যিক দৃষ্টিতে বিবরণ সম্পন্ন সূত্রগুলোকেই এ বিভাগের আওতাধীন করা হয়েছে।

গেয়্য ঃ গেয়্য অর্থে সাধারণত গানের উপযোগী বিষয়াবলিকে বোঝানো হয়। এটি গদ্যে ও পদ্যে মিশ্রিত। তবে ছন্দোবদ্ধতার কারণে এটি সহজেই সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করে এবং দীর্ঘদিন স্মৃতিতেও সংরক্ষণযোগ্য।

ব্যাকরণ ঃ এটি ব্যাখ্যা-বিবৃতিমূলক বুদ্ধবচন। এই অংশও গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত।

গাথা ঃ সম্পূর্ণ পদ্যরীতিতে ভাষিত বুদ্ধের আদেশ-উপদেশ সমূহই এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

উদান ঃ ভাবোদ্দীপক বা ভাবব্যঞ্জক উক্তির নাম উদান। খুদ্দক নিকায়ের জাতক, বিমানবত্থু ও পেতবত্থু গ্রন্থে এর উপস্থিতি দৃষ্ট হয়। উদান সর্বক্ষেত্রেই ছন্দোবদ্ধ পদ্য রীতিতে পরিবেশিত।

ইত্যুক্তক ঃ 'এ ভাবে বলা হয়েছে' - এ অর্থে ইত্যুক্তক। অর্থাৎ বুদ্ধ নিজের উপস্থাপিত, ভাষিত বা কৃত কোন বিষয় বা ঘটনা পরবর্তীতে সংঘটিত কোন প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে নতুনভাবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি পূর্ব উক্ত বিষয়াদির প্রকাশ করেছেন। এভাবে পূর্বোক্ত বিষয়কে নতুন করে উক্ত করাকেই ইত্যুক্তক বলে। ইত্যুক্তক গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকাশ রীতিতে বিদ্যমান।

জাতক ঃ কাহিনীমূলক রচনা। বুদ্ধের পূর্ব জন্মের কাহিনীকথা। অর্থাৎ বুদ্ধত্ব

---

৮ সূত্র পিটক, মধ্যম নিকায় (অলগদ্দোপম সূত্র)।

৯ সূত্রের প্রারম্ভিক কথা ; কখন, কোথায় এবং কেন বুদ্ধ এ সূত্র দেশনা করেছেন, তা এখানে উল্লেখ থাকে।

১০ সূত্র পিটকের পাঁচটি প্রধান বিভাগের একটি।

প্রাপ্তির সাধনাকালে বোধিসত্ত্বরূপে বুদ্ধ জন্ম-জন্মান্তরে যে কর্ম সাধন করেছেন তার বর্ণনাই হল জাতক।

অদ্ভুতধর্ম ঃ ত্রিপিটকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিষয় হিসেবে কিছু অতিপ্রাকৃত বা আশ্চর্যকর বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। এগুলোকে অদ্ভুতধর্ম বলা হয়েছে। এগুলোর মধ্যেও গদ্য-পদ্যরীতি বিদ্যমান।

বেদল্য ঃ বেদযুক্ত, তুষ্টিদায়ক সূত্রের নাম বেদল্য। অর্থাৎ বেদ-পারদর্শী বুদ্ধের সমসাময়িক কালের নানা পণ্ডিতগণের সাথে বুদ্ধের প্রশ্নোত্তরে আলোচনা হয়। এ আলোচনার মুখ্য অংশই রচনামূলক কিন্তু উদাহরণ ও উপমা হিসাবে অনেক ঘটনা ও বিষয়কে ছন্দোবদ্ধ রীতিতেও উপস্থাপন করা হয়েছে।

সুতরাং ত্রিপিটকের সমগ্র সত্ত্বার মধ্যে যে ছন্দের প্রবল প্রভাব বিদ্যমান তা সহজেই অনুমেয়। হয়ত এ ছন্দোবদ্ধতার কারণেই বুদ্ধের অনুগামী শিষ্যগণ দীর্ঘকাল তাঁর বাণী সমূহকে অবিকৃতভাবে স্মৃতিতে সংরক্ষণে সমর্থ হয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য, গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের তিনমাস পর ত্রিপিটক গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়। এ উপলক্ষে তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজগৃহে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় ভিক্ষুসংঘের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১১] বৌদ্ধ পরিভাষায় এটিকে 'প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি' বলে। এ সম্মেলনে পাঁচশত ত্রিপিটক পারঙ্গম অরহত (জাতিস্মর জ্ঞানসম্পন্ন) শীর্ষস্থানীয় নির্বাচিত ভিক্ষু যোগদান করেছিলেন। সাতমাস ব্যাপী স্থায়ী ছিল এ অধিবেশন। ত্রিপিটক সংকলনের জন্য এই সংগীতির গুরুত্ব অপরিসীম। ইতোপূর্বে গুরু-শিষ্য পরম্পরা শ্রুতি হতে স্মৃতিতে শাস্ত্র কথা রক্ষিত হয়ে আসছিল। এতে বুদ্ধ শিষ্যদের অকৃত্রিম স্মৃতি-সাধনার প্রাবল্য যেমন উপলব্ধ হয়, তেমনি শাস্ত্রকথার ছন্দোবদ্ধ গাঁথুনির ফলে যে প্রচ্ছন্ন সহায়ক শক্তি সৃষ্টি হয়েছে তাকেও অস্বীকার করা যায় না। কারণ শ্রুতি হতে স্মৃতিতে আয়ত্ত ও সংরক্ষণের জন্য বিষয়ের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি আবশ্যক। এই আবৃত্তিকালে শ্রুতিধরকে অবশ্যই কোন না কোন ভাবে একটি ছন্দের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। এগুতে হয় উদাত্ত অনুদাত্ত স্বরের এই প্রভেদকে গ্রহণ করেই। সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে অনাদিকাল হতে স্মৃতি সাধন কর্মে ছন্দ-স্বর ও মাত্রা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্রিয়াশীল ছিল এসত্য অবধারিত। এই স্রোতধারা শুধুমাত্র ত্রিপিটক সংকলনের পূর্বে নয় ; পরেও বহু সাধনামার্গানুশীলনকারীদের মধ্যে এ ধারা অব্যাহত

---

১১ Wilhelm Geiger, *The Mahavamsa* (Translated), New Delhi, 1986, p. 15

ছিল সাধনমার্গের একটি অনুসঙ্গী বিষয়। এ ধারা প্রবাহ্ প্রসারের প্রধান অবলম্বন হল 'ছন্দ'। 'ছন্দ' ছিল এ সাধনকর্মের প্রবল সহায়ক শক্তি।[১২] কারণ বক্তব্য ছন্দের বন্ধনে আবদ্ধ হলে যেমন শ্রুতিমধুর হয়, তেমনি স্মৃতিময়ও হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন - "মন্ত্রের ক্রিয়া কেবল জ্ঞানে নয়, তা প্রাণে মনে। স্মৃতির মধ্যে তা চিরকাল স্পন্দিত হয়ে বিরাজ করে, ছন্দের এই গুণ।"[১৩]

পালি সাহিত্যের ভিত্তিমূল ছন্দের এমন নির্ভরতা থাকা সত্ত্বেও আধুনিক পালি গবেষক ও সাহিত্যসেবিগণ এ বিষয়ের আলোচনা-গবেষণায় আজও কেউ তেমন এগিয়ে আসেননি। প্রাচীন সাহিত্য-সংস্কৃতির গবেষক নিহাররঞ্জন রায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহিত্যিকদের প্রসঙ্গে বলেছিলেন - "তাঁহারা স্পষ্টই বলিতেন, বুঝিতে পারিলেই হইল ; ছন্দ, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, শব্দ বা পদরীতি ইত্যাদি অশুদ্ধ বা অপ্রচলিত হইলেও কিছু ক্ষতি নাই।"[১৪] বস্তুত বক্তব্যের স্পষ্টতা ও সহজবোধ্যতার প্রতিই বৌদ্ধদের ঝোঁক ছিল বেশি। এ কারণেই হয়তো দর্শনশাস্ত্র হিসাবে পালি গ্রন্থ ভাণ্ডারের যতটুকু পরিচয়ের বিস্তার ঘটেছে, সাহিত্য হিসেবে এর ততটুকু পরিচয় প্রসার লাভ করেনি। অথচ এ পালি গ্রন্থভাণ্ডারে রয়েছে প্রচুর ঐতিহাসিক অমূল্য সাহিত্য উপাদান। আমাদের ধারনা মতে, পালি সাহিত্যের প্রয়োজনরূপ ও ধারাবাহিক অনগ্রসরতার কারণেই পালি ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের কাঙ্ক্ষিত বিস্তার আজও ঘটেনি।

পালি সাহিত্যের প্রবল জোয়ারের যুগে এ বিষয়ে যে গ্রন্থগুলো রচিত হয়েছিল সেগুলোর বৃহৎ অংশই আজ দুষ্প্রাপ্য। সুতরাং ঐতিহ্যবাহী পালি সাহিত্যাঙ্গনে ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ের আলোচনা সত্যিই আজ অপসৃত। কিন্তু বর্তমানে উচ্চ শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এর পঠন-পাঠনের প্রবাহ শুরু হয়েছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলা পূর্ব সাহিত্য যুগের বহু নতুন বিষয়ের উদ্ঘাটন হবে বলে আমরা আশা রাখি। এছাড়া প্রাচীনতম সাহিত্যতত্ত্বের মুল্যায়নেও পালি ছন্দ ও অলঙ্কার বিষয়ে গবেষণা হওয়া অত্যাবশ্যক বলে আমরা দাবি করি।

পালি ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ ও শাস্ত্রের উদ্ভব ঃ খ্রি. পূ. তিন শতক হতেই মূলত ত্রিপিটকের ওপর ভাষ্যকার বা অর্থকথা লেখার প্রচলন শুরু হয়।[১৫] এ সময় বিষয়

১২ A.K. Warder, *Introduction to Pali,* Oxford, 1991, p. 281.
১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছন্দ*, কলিকাতা, ১৯৭৬, পৃ. ২১২
১৪ নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* আদিপর্ব, কলিকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৮৬
১৫ পালিতে "অট্ঠকথা" বলে।

বৈচিত্র্য ও নিরবিচ্ছিন্ন ধারায় গ্রন্থ প্রকাশের কারণে পালি সাহিত্যজগত অত্যন্ত উর্বর হয়ে ওঠে। কিন্তু এসময় ছন্দ বা অলঙ্কার বিষয়ে কোন গ্রন্থ রচিত হয়েছিল কিনা তা আজও অনির্ণিত। রচিত হয়ে থাকলেও বর্তমান সময়ে এগুলো লুপ্ত প্রায়। অন্যান্য বৌদ্ধ ঐতিহ্যের মত এটিও আজ আমাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। তাই এই বিষয়টি দীর্ঘকাল আমাদের কাছে ছিল প্রচ্ছন্ন। পালি ছন্দ বিষয়ক যে গ্রন্থটি আজ পুনর্মুদ্রণের ফলে সহজলভ্য হয়েছে তার নাম 'বুত্তোদয়'। বুত্তোদয়-খ্রিস্টীয় বার শতকে সংঘরক্ষিত স্থবির কর্তৃক রচিত। এ গ্রন্থের পরিসর সীমিত হলেও পালি ছন্দের সূত্র উদ্ধারে এটি একটি অমূল্য গ্রন্থ। এটি সম্পূর্ণ পালি ভাষায় রচিত। ১৯৩৭ সালে এ গ্রন্থটি বাংলাদেশের পণ্ডিত ভিক্ষু শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। সম্প্রতি এই অনুবাদ সংস্করণটিই পুনঃ মুদ্রিত হয়। এছাড়া সংঘরক্ষিত স্থবির ব্যাকরণ-ছন্দ-অলঙ্কার বিষয়ে 'সম্বন্ধচিন্তা' ও 'সুবোধালংকার' নামে আরও দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন।[১৬] কিন্তু বর্তমানে এ গ্রন্থগুলোর দুষ্প্রাপ্যতা পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও পালি বা বৌদ্ধ সাহিত্য ভাণ্ডারের বহু গ্রন্থ আজ দুষ্প্রাপ্য। এগুলো কালের প্রবাহে অতলে তলিয়ে গেছে। অনুরূপ আরো বহু গ্রন্থের খোঁজ আজকাল মেলে না। কিন্তু এক সময় বৌদ্ধ সাহিত্য ভারত উপমহাদেশের জাগরণসৃষ্টি করেছিল। এ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের মন্তব্য স্মর্তব্য – "সাহিত্যের প্রভাবে, বক্তৃতার প্রভাবে বৌদ্ধগণ ভারতবর্ষীয় এমনকি সমস্ত এশিয়ার লোককে ধর্মপথে লইয়া গিয়াছিল"।[১৭] সুতরাং এক সময় যে এখানে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রাবল্য ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয় অন্য এক প্রসঙ্গে লিখেছেন – "বাংলায় এক সময় বহু বৌদ্ধ বইয়ের নকল হয়েছিল এবং অনেকে বৌদ্ধ ব্যাকরণ ও অভিধান হতে প্রমাণ উদ্ধার করে অনেক গ্রন্থ লিখেছিলেন– এঁদের মধ্যে চন্দ্রগোমী, জয়াদিত্য, বামন, জিনেন্দ্রবুদ্ধি, পুরুষোত্তম দেব ও মৈত্রেয় রক্ষিত প্রমুখ পণ্ডিতগণ অন্যতম।"[১৮]

অতএব অনুমিত হয় যে, বৌদ্ধ সাহিত্যের অতীত গৌরবের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এখনো ঘটেনি। তাই 'বুত্তোদয়' যে পালি ছন্দশাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ এ বিষয়ে সর্বসম্মত হওয়া দুঃসাধ্য। কারণ 'বুত্তোদয়' গ্রন্থের উদ্ভব কাল প্রকৃত পক্ষে পালি সাহিত্যের নিস্তরঙ্গ জোয়ারের যুগে (১২ শতকে)। সুতরাং এ সময় যদি এরূপ একটি অমূল্য গ্রন্থ রচিত হতে পারে, পূর্বে যে এ জাতীয় গ্রন্থ রচিত হয়নি তা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য।

---

১৬ ধর্মাধার মহাস্থবির, *শাসন বংশ* (অনূদিত), কলিকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ৫২
১৭ *হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ*, ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃ. ২৪২
১৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০২

সংঘরক্ষিত স্থবিরের 'বুত্তোদয়' নামের এই ছন্দ শাস্ত্রটি কেদার বট্টের 'বৃত্তরত্নাকরের' ছন্দরীতিতে লিখিত। কিন্তু বুত্তোদয়ে বৈদিক ছন্দ স্থান পায়নি। লৌকিক (পালি সূত্রের) ছন্দ সমূহই এখানে আলোচিত হয়েছে।[১৯] সংস্কৃতের সাথে পালির যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকার ফলে বুত্তোদয়ের অনেক সূত্রের সাথে বৃত্তরত্নাকরের মিল দেখা যায়। সংঘরক্ষিত স্থবির বৃত্তরত্নাকর অনুসরণ করেছিলেন কিনা তা কোথাও উল্লেখ করেননি। কিন্তু সে সময়ে বৃত্তরত্নাকর গ্রন্থটি পালি-সংস্কৃত ছন্দের আলোচনায় অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য গ্রন্থ ছিল। কারণ গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' প্রচারিত হওয়ার আগে কালিদাসের 'শ্রুতবোধ', ক্ষেমেন্দ্রের 'সুবৃত্ততিলক', হেমচন্দ্রসূরির 'ছন্দোহনুশাসন' ও কেদার ভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' ইত্যাদি ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদা পেয়েছে কেদার ভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থটি।[২০] এতে ১৩৬ প্রকার সংস্কৃত ছন্দের বিবরণ আছে।

সংঘরক্ষিত স্থবিরের আগে ব্রহ্মদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ আচার্য রচিত 'সদ্দনীতি' নামক একটি পালি অলঙ্কার বিষয়ক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া 'মহারূপসিদ্ধি' ও 'মুখমত্তদীপনী' নামেও অন্য দু'টি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। এগুলো আজ বিলুপ্ত। সুতরাং পালি ছন্দ শাস্ত্রের উদ্ভব কাল খ্রিস্টীয় বার শতক নয় ; অবশ্যই এর অনেক আগে। হয়তো 'সদ্দনীতি' ও 'মুখমত্তদীপনী' গ্রন্থের মত ব্যাকরণ গ্রন্থের কোলাহলে নতুন গ্রন্থগুলো স্থান করে নিতে পারেনি। এ গ্রন্থগুলো খ্রিস্টীয় ছয়-সাত শতকে রচিত। সুতরাং এ সময় কিংবা এর আরও আগে যে ছন্দ বিষয়ক গ্রন্থ রচিত হয়নি তা স্থির করে বলা কঠিন।

পালি ছন্দের পরিচয়

পালি ছন্দ প্রকরণ বিন্যাসের আগে এ ছন্দের মাত্রা, গণ ও পদের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

মাত্রা (মত্তা) ঃ পালিতে সাধারণত লঘুস্বর এক মাত্রা এবং গুরুস্বর দুই মাত্রা হয়। সংযুক্তাক্ষরের পূর্বাক্ষর, দীর্ঘাক্ষর, অনুস্বারের পূর্বাক্ষর ও পাদের (পদের) অন্ত অক্ষরকে গুরু অক্ষর ধরা হয়।

এখানে লঘু (shrot) ও গুরু (long) স্বরের মাত্রার হিসাব বাংলা ছন্দনীতির

---

১৯ 'ইদং বুত্তোদয়ং নাম লোকিযচ্ছন্দ-নিস্মিতং' বুত্তোদয়, ভূমিকা, পৃ. ৯

২০ মনীন্দ্র সমাজদার, *সংস্কৃত, প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ২২০

যথাক্রমে মুক্তাক্ষর (open syllable) ও বদ্ধাক্ষর (closed syllable)-এর মত নয়। বাংলা মুক্তাক্ষর প্রায় সব ছন্দেই এক মাত্রা। কিন্তু পালিতে এটি দুই মাত্রা। বাংলায় বদ্ধাক্ষরের মাত্রা বিভিন্ন ছন্দে পরিবর্তিত হয়। অনুরূপ পালিতে গুরুস্বর ছন্দভেদে পরিবর্তন হয়। পালিতে - অ, ই, উ - এই তিনটি হ্রস্বস্বর বা লঘুস্বর (short vowel), আর আ, ঈ, ঊ, এ ও - এই পাঁচটি হল দীর্ঘস্বর (long vowels)।

প্রমিত পালি স্ক্রিপ্টে (script-এ) এগুলোকে এভাবে দেখানো হয়েছে ; যেমন - shot vowels : A, I, U, এবং long vowels : $\bar{A}$, $\bar{I}$, $\bar{U}$, $\bar{E}$, $\bar{O}$[২১]। যেহেতু রোমান হরফকেই পালির প্রমিত রূপ ধরা হয়, সেহেতু মাত্রা নিরূপণের প্রয়োজনে এর পরিচয় এখানে দেয়া হল।

মাত্রা চিহ্ন ঃ পালি ছন্দে ব্যবহৃত মাত্রা চিহ্ন সংস্কৃত ও বাংলায় ব্যবহৃত মাত্রা চিহ্নের সমরূপ। অর্থাৎ গুরুস্বরের দুই মাত্রা বোঝাতে একটি ঋজু রেখা (–) এবং হ্রস্বস্বরের একমাত্রা বোঝাতে একটি বক্র রেখা (◡) চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাদ ঃ 'পাদো ঞেয্যো চতুত্থংসো পদচ্ছেদো যতিরভাবে'- অর্থাৎ শ্লোকের এক চতুর্থাংশের নাম পাদ। পাদের ছেদ বা অন্তে যতি হয়। পাদ বা পদ তিন প্রকার। যথা - সমপাদ, অর্দ্ধসমপাদ[২২] ও বিস্‌মপাদ[২৩]।

সমপাদ ঃ এক সাথে ব্যবহৃত বা সংযুক্ত পাদ (পদ) সমূহের মাত্রা যদি সমান থাকে, তাকে সমপাদ (সমপদ) বলে। যেমন -

চক্‌খুনা সংবরো সাধু । সাধু সোতেন সংবরো,
ঘাণেন সংবরো সাধু । সাধু জিহ্বায় সংবরো।

–ধম্মপদ (ভক্‌খুবগ্‌গ), সুত্তপিটক

অর্দ্ধসমপাদ ঃ কোন ছন্দ রীতিতে ব্যবহৃত পদসমূহের মধ্যে যখন দেখা যায় যে, প্রথম পদ তৃতীয় পদের সাথে এবং দ্বিতীয় পদ চতুর্থ পদের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ তখন তাকে অর্দ্ধসমপাদ (অর্ধসমপদ) বলে। যেমন -

---

২১ *Introduction to Pali*, p. 2
২২ পালিতে রেফ (র্) এর ব্যবহার নেই। এ স্থলে ব্যবহৃত বর্ণের দ্বিত্ব হয়।
২৩ পালিতে শুধুমাত্র 'স'-এর ব্যবহার হয়। পালি রোমান স্ক্রিপট-এ 'স' -এর উচ্চারণ 'SA' এভাবে হয়।

যথাগারং দুচ্ছন্নং । বুট্‌ঠি সমতিবিজ্‌ঝতি, এবং

অভাবিতং চিত্তং । রাগো সমতিবিজ্‌ঝতি ।।

–ধম্মপদ (যমকবগ্‌গ) সুত্তপিটক

বিস্‌মপাদ ঃ কোন ছন্দে বা শ্লোকে ব্যবহৃত পদসমূহ যখন 'সমপাদ' ও 'অর্দ্ধসমপাদ' রীতির কোনটির সাথে সঙ্গতি বিধান করে না তখন সে পদকে বলা হয় বিসম্‌পাদ (বিষমপদ)। যেমন –

একঞ্চ ভাবিতত্তানং । মুহুত্তম্পি পূজয়ে,

সাযেব পুজনা সেয্যো । যঞ্চে বস্‌সতং হুতং।

– ধম্মপদ (সহস্সবগ্‌গ) সুত্তপিটক

গণ ঃ ছন্দের স্বরূপ ও মাত্রা নির্ণয়ে অত্যন্ত গুরুত্ববহ বিষয় 'গণ'। শব্দের গুরু-লঘু অক্ষর ভেদে মাত্রা নির্ণয়ের রীতিকেই মুলত গণ (syllabalic feet) বলা হয়। পদের প্রথম তিন অক্ষর যুক্ত হয়েই একটি 'গণ' হয়।

পালিতে গণ–আটটি। সংস্কৃতে অবশ্য গণ–দশটি। সংস্কৃতের 'গ' ও 'ল' গণ পালিতে নেই। পালির আটটি গণ হল ; – ম–গণ, য– গণ, র–গণ, স–গণ, ত–গণ, জ–গণ, ভ–গণ, ন–গণ।

এই আটটি গণের মাত্রা চিহ্ন হল নিম্নরূপ। যথা – ম–গণ = – – – –। অর্থাৎ সমস্ত গুরু অক্ষরযুক্ত গণের নাম ম–গণ। য–গণ= ◡– – । অর্থাৎ আদি লঘু, মধ্যে ও শেষে গুরু অক্ষর যুক্ত গণের নাম য–গণ।

অনুরূপ, র-গণ= - ◡ -।

স-গণ= ◡ ◡ -।

ত-গণ= - - ◡ ।

জ-গণ= ◡ - ◡ ।

ভ-গণ= - ◡ ◡ ।

ন-গণ= ◡ ◡ ◡ ।

পালির এই আটটি 'গণ'-কে বোঝার জন্য কবি সৈয়দ আলাওল এর 'পদ্মাবতী' কাব্য হতে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা যেতে পারে। তিনি অত্যন্ত সুচারুভাবে তাঁর কবিত্ব প্রতিভায় এই আটটি গণ-কে প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রকাশভঙ্গি হল নিম্নরূপ -

"প্রথমে কহিব 'গণ' গণের ব্যাখ্যান।
কবিত্বের মূল সেই শুন বুদ্ধিমান।। • • •
'ম'গণ 'য'-গণ আর 'র'-গণ 'স'-গণ।
'ত'-গণ 'জ'-গণ অন্তে 'ভ'-গণ 'ন'-গণ।।
এই অষ্ট মহা 'গণ', দেখহ বিদিত।
বিবরিয়া কহি তবে 'গণে'র চরিত।।
লঘু গুরু জানিলে 'গণে'র ভেদ পায়।
তে কারণে লঘু-গুরু জানিতে জুয়ায়।।

হ্রস্ব অ, ই, উ, ঋ, ঌ অক্ষর মুকুল। (বি ঃ দ্রঃ পালিতে ঋ, ঌ এর ব্যবহার নেই)

এই পাঁচ লঘু আর গুরু যে সকল।।
কবিতার পদের প্রথম তিনাক্ষর।
বিচারিবা কেবা লঘু কেবা গুরু হয়।।
তিন গুরু হৈলে তারে বলিবে 'ম'-গণ।(- - -)
নিধি স্থির বন্ধু প্রাপ্তি হয় ততিক্ষণ।।
আদ্য লঘু, দুই গুরু হয় অন্ত্যেয়ার । (◡ - -)
তাহারে 'য' গণ বলি বুঝিয়া বিচার ।।
মধ্যে লঘু, দুই দিকে দুই গুরু হয় । (- ◡ -)
সেই যে 'র' গণ হয়, জানিও নিশ্চয় । • • •
অন্ত্যে গুরু, আদ্যে মধ্যে লঘুর প্রচার । (◡ ◡ -)
সুনিশ্চিত জানি 'স' গণ নাম তার ।
আদ্য মধ্য গুরু, অন্ত্যাক্ষর লঘু বটে ।(- - ◡)
তাহারে 'ত' গণ বলি জানিও প্রকটে ।।

মধ্যে গুরু, দুই দিকে দুই লঘু হয় (◡ – ◡)
তাহারে 'জ' গণ বলি ব্যুৎপত্তি করয় ।।
অন্ত্যে মধ্যে লঘু যার গুরু আদ্যকর । (–◡ ◡)
'ভ' গণ মঙ্গল-ফল দেন্ত বহুতর ।।
তিন লঘু 'ন' গণ সম্পদ বুদ্ধি বুদ্ধি । (◡ ◡ ◡)
রণ-সিদ্ধি আপদ-তরণ কার্য-সিদ্ধি ।।[২৪]

এ কাব্যাংশ হতে 'গণ'–এর পরিচয় সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়।

পালি ছন্দ ঃ পালি ছন্দ প্রধানত দুভাগে বিভাজিত। যথা – একটি মত্ত (মাত্রা) ছন্দ বা জাতি, অপরটি বুত্ত ছন্দ বা অক্ষর ছন্দ।

মত্তা (মাত্তা) ছন্দ ঃ মাত্রা ছন্দ বলতে সাধারণত গীতিময় ছন্দ বা প্রবাহ সম্পন্ন ছন্দকে বোঝানো হয়। এ ছন্দের গণ–সমূহ চার কলা বা মাত্রা বিশিষ্ট হয়। এগুলোর লঘু (হ্রস্ব) স্বরে এক মাত্রা ও গুরু (দীর্ঘ) স্বরে দুই মাত্রা হয়।

মত্তা ছন্দের প্রকার ভেদ ঃ মত্তা (মাত্রা) ছন্দ প্রধানত চার প্রকার। যথা– ১. অরিযা (আর্যা) জাতি, ২ গীতিজাতি, ৩. বেতালীয় (বৈতালীয়) জাতি, ৪, মত্ত (মাত্রা) সমক জাতি। এগুলোর প্রতেকটির আবার অন্তঃস্থ ভেদ বিদ্যমান।

১. অরিয়া (আর্যা) জাতি

ছট্‌ঠো খিল লহুজো বা গযুতাঞ্‌ঞে ছগ্‌গণা ন জো বিসমে

অরিযাযন্তদ্ধে ছট্‌ঠোন্তে গো গণা ছঞ্‌ঞে।

– অরিযা ছন্দের প্রথমার্দ্ধে ষষ্ঠ গণ–ন–গণ অথবা জ–গণ হবে। অবশিষ্ট ছয়টি গণের সাথে একটি গুরু অক্ষরসহ থাকবে। বিষমে (অর্থাৎ প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম গণে) জ–গণ হবে না। এ ছন্দের শেষার্দ্ধে ষষ্ঠ বর্ণ লঘু এবং একটি অক্ষরসহ অন্য ছয়টি গণ থাকে।

· অরিয়া জাতি ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদে বার মাত্রা। দ্বিতীয় পাদে আঠার মাত্রা এবং চতুর্থ পাদে পনর মাত্রা হবে (১২:১৮:১২:১৫)।

অরিযা জাতির পাঁচটি অন্তঃস্থ ভেদ আছে। যথা – পথ্যা, বিপুলা, চপলা, মুখচপলা ও জগন চপলা।

---

২৪ কবি আবদুল কাদির রচিত '*বাঙলা ছন্দের ইতিবৃত্ত*' (১৯৮৫) গ্রন্থ হতে গৃহীত।

গণ-সমূহের বিবিধ প্রকার ব্যবহারের বা প্রয়োগের কারণে উপরে উল্লিখিত অরিযা জাতি (মাত্রা) ছন্দের ভেদ সমূহ হয়। 'চর্যাপদ' গ্রন্থে অরিযা জাতি (মাত্রা) ছন্দের বিভিন্ন ভেদের দৃষ্টান্ত রয়েছে।[২৫]

২. গীতি জাতি ঃ সব্বং পঠম দলে যদি লক্‌খণমরিয়ায় বুত্তমুভসেসু

যস্‌সা দলেসু যুত্তং বুত্তা সা গীতিবুত্তযতিললিতা।

– অরিযা ছন্দের প্রথম সূত্রে উল্লিখিত লক্ষণ সমূহ যে ছন্দের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে থাকে, তাকে গীতিজাতি বা গীতি মাত্রা ছন্দ বলে।

গীতি জাতি বা গীতি মাত্রা ছন্দে সাধারণত প্রথম ও তৃতীয় পাদে বার মাত্রা এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে আঠার মাত্রা (১২:১৮/১২:১৮) হয়।

গীতি জাতি ছন্দের তিনটি ভেদ রয়েছে। যথা – উপগীতি, উগ্‌গীতি ও অরিযাগীতি।

এগুলোতে গণের বহুধা ব্যবহার ও মাত্রার পরিবর্তন দেখানো হয়েছে। মূলত মুখ্য নিয়মের যে তারতম্য হতে পারে সেটাই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

৩. বেতলীয় (বৈতালীয়) জাতি ঃ যে ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় পাদে ছয় মাত্রার পর র-গণ, একটি লঘু ও একটি গুরু অক্ষর থাকে, এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদে আট মাত্রার পর র-গণ ও একটি লঘু ও একটি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে বেতালীয় জাতি ছন্দ বলা হয়।

উদাহরণ হিসেবে এখানে বেতালীয় ছন্দের সংজ্ঞা নিরূপণীয় শ্লোকটি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে বৈতালীয় ছন্দের মাত্রার বহির্প্রকাশ ঘটেছে।

বিসমে ছ সিযুং কলা মুখে সমতেঁঠরলগা ততোপরি।

বেতালীয়ন্তমুচ্চতে লহু ছক্কং ন নিরন্তরং সমে।।

বেতালীয় জাতি ছন্দের অন্তঃস্থ ভেদ নয়টি। যথা-ওপচ্ছন্দসিক, আপাতলিকা, দক্‌খিণান্তিকা, উদিচ্চবুত্তি, পচ্চবুত্তি, পবত্তকা, অপরান্তিকা, চারুহাসিনী ও অচলধিতি।

এগুলোতে গণ-ভেদে স্বরের (গুরু-লঘু) বিবিধ প্রয়োগ দেখানো হয়েছে।

৪. মত্তা (মাত্রা) সমক জাতি ঃ এটি মাত্রা বা জাতি ছন্দের চতুর্থ ও শেষ বিভাগ। মাত্রা সমক জাতি এর সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে-

---

২৫ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫

মত্তা সমকং নবমোল্‌গন্তে।

অর্থাৎ ষোল মাত্রা বিশিষ্ট পাদে নবম অক্ষর লঘু এবং অন্ত অক্ষর গুরু হয় তাকে 'মত্তা সমক জাতি' বলে।

যথা– যং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলঞ্চ

-- ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪ - ∪

যো চা'মনাপো সকুনস সদ্দো

-- ∪ - - ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ -

(– মহাজয়মঙ্গল গাথা)

মত্তা সমক জাতির পাঁচটি ভেদ আছে। যথা– বিসিলোক, বানবাসিকা, চিত্রা, উপচিত্রা ও পাদাকুলক।

এখানে পাদাকুলক মাত্রা ছন্দটি বহু পরিচিত। এটি অনেকটা বাংলা পয়ার রীতির মত। তবে এটি যেহেতু ১৬ মাত্রার পরিবেশনা তাই এটিকে ঠিক বাংলা পয়ারও বলা যায় না। এর বহুল প্রচলন আছে চর্যাপদে। বুত্তোদয়ে পাদাকুলক সম্পর্কে বলা হয়েছে –

যমতীত–লক্‌খণ – বিসেস–যুতা
মত্তাসমাদি – পাদা ভিহিতা,
অনিযতবুত্ত পরিমাণ–সহিতা
পথিতা জনেসু পাদাকুলকা।

অর্থাৎ, যে ছন্দের পাদ সমূহে মাত্রার সমকতা বিদ্যমান থাকে, অথচ কোন নির্দিষ্ট ছন্দের নিয়মাধীন নয় তাকে 'পাদাকুলক মাত্রা সমক জাতি' ছন্দ বলে। কবি আবদুল কাদির চর্যাপদের ছন্দ আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন– "৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬ মাত্রা। এরূপ দু'টি পূর্ণ পংক্তি নিয়েই গঠিত হয় পাদাকুলক ছন্দের শ্লোক।" কবি আবদুল কাদির 'চর্যাপদ হতে এর উদাহরণ দেখিয়েছেন এভাবে :

∪ ∪ - - - ∪ ∪ - - -

অপণা মাংসে হারিণা বৈরী ।

∪ ∪ ∪ ∪ - ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ ∪

খণই ণ ছাড়ল ভুসুকু অহেরী ।

(চর্যা-৬)

পালিতে এরূপ ছন্দ আনুপাতিক হারে অনেক কম। নিচে একটি পালি উদাহরণ প্রদান করা হল :

∪ ∪ - ∪ ∪ ∪ - - - ∪
মূলে দুমিন্দস্থ নিসজ্জ যস্থ
∪ - ∪ - ∪ ∪ ∪ - ∪ - -
ধীরো সুবোধ চতুসচ্চ মগগং
-- ∪ ∪ - ∪ - ∪ ∪ - -
মারং জিনিত্বা সমারং মুনিন্দো
- - ∪ - - ∪ ∪ - ∪ - -
তম্পাদপিন্দং সিরসা নমামি ।

তম্পাদপিন্দং সিরসা নমামি।

(বোধি বন্দনা গাথা, সুত্তপিটক)

অনুবাদ : যে বৃক্ষরাজের মূলে বসে মুনীন্দ্র বুদ্ধ সসৈন্য মারকে পরাস্ত করে চতুরার্য্য সত্য অবগত হয়েছিলেন, সে বৃক্ষের পাদকেন্দ্রকে আমি অবনত বন্দনা করছি।

উপরের দু'লাইন পাদাকূলক '১৬ মাত্রা' 'নিচের দু'লাইনকে' ব্যতিক্রান্ত পাদাকূলক বলা যেতে পারে (১৮ মাত্রা)। উল্লেখ্য যে, ১৬ মাত্রার পাদাকূলক ছন্দে ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬ মাত্রা না হয়ে ৫ + ৪ + ৪ + ৩ + = ১৬ মাত্রা, এভাবেও হতে পারে। এই ব্যতিক্রমগুলোই হল ব্যতিক্রম পাদাকূলক।

এখানে মাত্রা বা জাতি ছন্দের আলোচনা সমাপন করা হল। এবার পালি মূল ছন্দ বিভাজনের দ্বিতীয় বিভাগ বৃত্ত ছন্দ বা অক্ষর ছন্দের আলোচনায় আসা যাক।

পালি বৃত্ত ছন্দ বা অক্ষর ছন্দ

পালি বৃত্ত (অক্ষর) ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। যথা – (১) সমবৃত্ত (২) অসমবৃত্ত ও (৩) বিসমবৃত্ত।

১। সমবুত্ত ছন্দ

যেসব শ্লোকের চারটি পাদ লক্ষণবশে সমান, তাকে সমবুত্ত বা সমবৃত্ত অক্ষর ছন্দ বলা হয়। পালি ছন্দতত্ত্ববিদ সংঘরক্ষিত স্থবির তাঁর 'বুত্তোদয়' গ্রন্থে সমবুত্ত ছন্দে এক থেকে পাঁচ অক্ষর যুক্ত পদ বাদ দিয়ে ছয় থেকে বাইশ অক্ষর যুক্ত পদের প্রয়োগ দেখিয়েছেন।

বাংলা ছন্দের অক্ষর বৃত্তের সাথে এর ধ্বন্যাত্মক মিল অনুমিত হয়। যেমন পালির মাত্রা ছন্দের অন্তর্গত 'মাত্রা সমক জাতি' ভেদের পাদাকুলক ছন্দের সাথেও এর ধ্বন্যাত্মক মিল পাওয়া যায়। তবে সঠিক মাত্রা নিরূপণ, বা সুক্ষ্ম বিশ্লেষণে এগুলোতে পার্থক্য প্রমাণিত হয়।

সমবুত্ত ছন্দ নির্ধারণের প্রধান উপায় হল পাদের সম মাত্রা নির্ণয় করা। অর্থাৎ ১৬ মাত্রা কিংবা ২০ মাত্রা হলে এর পাদ সমূহ সমভাবে বিভাজিত হবে। যেমন ৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬ কিংবা ৫ + ৫ + ৫ + ৫ = ২০ মাত্রা। এর স্বরশ্রুতি অনেকটা বাংলা 'পয়ার' ও পালি পাদাকুলক ছন্দের মত। যদিও বাংলা পয়ার এর মধ্যযুগীয় রীতি ৮/৬ পর্বদ্বয়ে বিভক্ত হয়ে ১৪ মাত্রার সমিল চরণে বাঁধা।[২৬] কিন্তু পালি সমবুত্তে পর্ব সমান থাকে। পূর্বের মাত্রা সংখ্যা কমও হতে পারে। তবে একথা স্বীকার করা বাঞ্ছনীয় যে, পঠন রীতির কারণে শ্লোকের বা পাদের (পদের) মাত্রার কিংবা পর্বের মাত্রার তারতম্য হতে পারে। এক্ষেত্রে পালি ছন্দের সাথে যেহেতু প্রাকৃত ছন্দের যথেষ্ট মিল রয়েছে, সেজন্যে এখানে চর্যাপদ-এর উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, চর্যাপদের প্রথম চর্যাটি সিদ্ধাচার্য লুইপাদ 'রাগ পটমঞ্জরী'-তে লিখেছেন। জ্ঞানতাপস ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এটিকে ৪ + ৪+ ৪ + ৪ = ১৬ মাত্রার পাদাকুলক ছন্দ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এ ছন্দ রীতিতে দেখা যায় সপ্তম লাইনে হঠাৎ মাত্রা বেড়ে যায়। শহীদুল্লাহ সাহেব এতে পাঠে স্বরের সংকোচন গ্রাহ্য বলে মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এর মাত্রা বিন্যাস দেখিয়েছেন এভাবে –

৪ ৪ ৪

(১ লাইন) কা আ / তরু বর / পঞ্চবি / ডাল।

(৭ লাইন) এড়ি অউ / ছন্দে বান্ধ / করন ক / পটের আস।

এখানে 'পটের আস'-পর্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "In the 7th line in

---

২৬ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

place of পটের আস, the reading should be পটেরাস, It may be also due to false reading."[২৭]

কবি আবদুল কাদির এটিকে ১৫ মাত্রায় (৪ + ৪ + ৪ + ৩) বিন্যাস করে দেখিয়েছেন।[২৮]

-- ∪ ∪ ∪ ∪ - ∪ ∪ - ∪
কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল

সপ্তম পংক্তি সম্পর্কে তিনি বলেছেন এর ধ্বনি–সাম্য দোহাড়িকা রীতিতেই সিদ্ধ। তবে তিনি উল্লেখ করেছেন "পংক্তি প্রান্তের লঘুবর্ণ বিকল্পে গুরু ব'লে গণ্য হ'লে অথবা পংক্তি শেষে এক মাত্রার ফাঁক ধরলে তাতে ১৬ মাত্রা হয়।" সুতরাং আবৃত্তি বা পঠন রীতির উপর মাত্রা নির্ণয়ের বিষয়টি বহুলাংশে নির্ভরশীল। পালি ছন্দে এই পঠন বা আবৃত্তির প্রভাব বিশেষভাবে গণ্য হয়। কারণ ত্রিপিটকের সূত্র সমূহ (বুদ্ধের বাণী ও উপদেশের শ্লোক সমূহ) পূর্বে শুধু মাত্র আবৃত্তির মাধ্যমেই রক্ষিত ও প্রচারিত হয়েছিল। পালির এই সূত্রগুলোর আবৃত্তিতে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ছন্দ হল সমবৃত্ত ছন্দ। পালিতে মাত্রা ছন্দের আর্যা ও পাদাকুলক এবং বৃত্ত (অক্ষর) ছন্দের সমবৃত্ত ছন্দও এর অন্তঃস্ত ভেদ সমূহ বহুল প্রচলিত।

সমবৃত্ত ছন্দের প্রধান বিভাজন ১৭টি। এগুলোর প্রত্যেকটিতে আবার উপ–বিভাজন বা অন্তঃবিভাগ আছে। এখানে প্রধান ১৭টি ভেদ উল্লেখ করা হল– ১. গায়ত্তি (গায়ত্রী), ২. উণ্হী (উষ্ণী), ৩. অনুট্ঠভ (অনুষ্টভ), ৪. ব্রহতী (বৃহতী), ৫. (পংক্তি), ৬. তুট্ঠভ (ত্রিষ্টুভ), ৭. জগতি, ৮. অতিজগতি, ৯. সক্করী (শকরী), ১০. অতিসক্করী (অতিশকরী), ১১. অট্ঠি (অষ্টি), ১২. অচ্চট্ঠি (অত্যষ্টি), ১৩. ধুতি (ধৃতি), ১৪. অতিধুতি (অতিধৃতি), ১৫. কতি (কৃতি), ১৬. পকতি (প্রকৃতি), ১৭. আকতি (আকৃতি)।

সমবৃত্ত ছন্দের অন্তঃস্ত বিভাজন প্রক্রিয়া দীর্ঘ হলেও এর মধ্যে ছন্দ নিরূপণে কোন জটিলতা নেই, বরং গণ সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে বিষয়কে করেছে সরল ও সহজবোধ্য। বিশেষ করে প্রধান বিভাজনগুলোর যে আবার অভ্যন্তরীণ বিশ্লেষণ হয়েছে এতে সমবৃত্ত ছন্দের মাত্রা–প্রকৃতি অত্যধিক স্বচ্ছ হয়েছে এবং সহজ

---

২৭ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, *বাংলা কবিতার ছন্দ,* ঢাকা, ১৯৯৪, পৃ. ২৬

২৮ Dr. Muhammad Shahidullah, *Buddhist Mystic Songs*, Bengali Academy, Dhaka, 1960, p. xxii-xxiii.

নিরূপণযোগ্য হয়েছে। এখানে সমবুত্ত ছন্দের একটি সাধারণ উদাহরণ সংযোজন করা হল।

'– ∪ ∪ – – – – ∪ ∪ – –
এ্যানং দসমদ্ধে/এ্রে যো তব সখা,
–– ∪ ∪ – – – – ∪ ∪ – –
বিথারিত মাসে/সঙ্গে তর ভাগা।

– (বুত্তোদয়)

এখানে প্রত্যক পাদে ১০ মাত্রা রয়েছে। এরূপ ৬ থেকে ২২ অক্ষরের নানারূপ প্রয়োগ এই সমবুত্ত ছন্দে দেখানো হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে মাত্রা সমতার কিঞ্চিৎ তারতম্য আলোচিত হয়েছে। সংস্কৃত সমবৃত্ত ছন্দও বহুধা বিভক্ত। এগুলোর মধ্যে প্রধান রূপ হচ্ছে ছাব্বিশটি (২৬টি)।

পালি সমবুত্ত ছন্দের উল্লিখিত ১৭টি বিভাজন সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল–

১. গায়ত্তি (গায়িত্রী) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রত্যেক পাদ (পদ) হয় মাত্র ছয় অক্ষর সম্পন্ন। তনুমজ্ঝা ছন্দ এই শ্রেণীভুক্ত। তনুমজ্ঝা ছন্দের বিশেষত্ব হল – এই ছন্দাশ্রিত শ্লোকের প্রত্যেক পাদে একটি ত–গণ থাকে। যেমন –

যং কিঞ্চিং । ইধ বা হুরংবো,
সগ্‌গেসু বযং । রতনং পণীতং।

– (রতন সুত্ত, সুত্তপিটক)

২. উর্ণহী (উষ্ণী) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রত্যেক পাদ (পদ) হয় সাত অক্ষর সম্পন্ন। কুমার ললিতা ছন্দ এই শ্রেণীভুক্ত। কুমার ললিতার বিশেষত্ব হল – এই ছন্দাশ্রিত শ্লোকের প্রতি পাদে একটি জ–গণ, একটি স–গণ ও একটি গুরু অক্ষর থাকে। যেমন –

তথা সদিস খেত্তং । ন লোকতরস্মিং,
পদক্ক মুনমখং । বিপচ্চতি মেনংপি।

– (বুত্তোদয়)

৩. **অনুট্‌ঠভ (অনুষ্টুভ)** ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রত্যেক পাদ (পদ) হয় আট অক্ষর সম্পন্ন। 'চিত্রপদা' ছন্দ এই শ্রেণীভুক্ত। এর বিশেষত্ব হল – এই ছন্দাশ্রিত শ্লোকের প্রতি পাদে দু'টি ভ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর থাকে। যেমন –

অপ্পনেহি নাথস্‌স । সামনে সাধু সম্মতে,

অমনুস্মোহ চণ্ডেহি । সদা কিব্বি সকারীহি,

– (আটানাটিয়া সুত্তং, সুত্তপিটক)

এ ছাড়া বিজ্জমালা, মাণবকা, সমানিকা, পমানিকা ছন্দ প্রভৃতিও অনুট্‌ঠভ ছন্দের শ্রেণীভুক্ত। আট অক্ষরসম্পন্ন পাদের মধ্যে গণের বিভিন্নতর প্রয়োগের প্রেক্ষিতে এই শ্রেণী বিন্যাসগুলো হয়েছে।

৪. **ব্রহতী (বৃহতী)** ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রত্যেক পাদ (পদ) হয় নয় অক্ষর সম্পন্ন। হলমুখী, ভুজগ–সুসুহতা প্রভৃতি ছন্দ এই শ্রেণীভুক্ত।

৫. **পত্তি (পংক্তি)** ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ (পদ) হয় দশ অক্ষর বিশিষ্ট। সুদ্ধ–বিরাজিত, পণব, রুম্মবতী, মত্তা, চম্পকমালা, মনোরমা, উব্‌ভাসক, উপট্‌ঠিতা প্রভৃতি ছন্দ রীতি এই শ্রেণীভুক্ত। বিবিধ গণের প্রয়োগের বিভিন্নতার ভিত্তিতে উপর্যুক্ত নামীয় ছন্দের শ্রেণী বিন্যাসগুলো নিরূপিত হয়।

৬. **তুট্‌ঠভ (ত্রিষ্টুভ)** ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ (পদ) হয় এগার অক্ষর বিশিষ্ট। ইন্দ বজিরা, উপেন্দবজিরা, উপজাতি, সুমুখী, দোধক, সালিনী বাতোস্‌মী, সুরসসিরী, রথোদ্ধতা, স্বাগতা ও ভদ্দিকা প্রভৃতি ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত। গণের বিবিধ প্রকার প্রয়োগের ভিত্তিতে উপরোক্ত ছন্দ রীতি সমূহ নিরূপিত হয়।

৭. **জগতি** ঃ জগতি ছন্দরীতিতে প্রতিটি পাদ হয় বার অক্ষর বিশিষ্ট। বংসট্‌ঠা, ইন্দবংসা, তোটক, দুতবিলম্বিত, পুট, কুসুমবিচিত্তা, ভুজঙ্গপ্পয়াত, পিয়ংবদা, ললিতা, পমিতাক্‌খরা, উজ্জলা, বেস্‌সদেবী, তামরস ও কমলা প্রভৃতি জগতি ছন্দের ভেদ। এগুলোও বিবিধ গণের বিভিন্ন প্রকার প্রয়োগের ভিত্তিতে উপর্যুক্ত ছন্দরূপ নিরূপিত হয়।

৮. **অতিজগতি** ঃ এই ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় তের অক্ষর বিশিষ্ট। পহাসিনী, রুচিরা প্রভৃতি ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

৯. **সক্করী (শর্করী)** ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় চৌদ্দ অক্ষর বিশিষ্ট। অপরাজিতা, পহরণকলিকা, বসন্ততিলকা প্রভৃতি ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১০. **অতিসক্করী** (অতিশর্করী) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় পনর অক্ষর বিশিষ্ট। সসিকলা, মণিগুণনিকর, মালিনী, পভদ্দক প্রভৃতি ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১১. **অট্‌ঠি** (অষ্টি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় ষোল অক্ষর বিশিষ্ট। বাণিনী ছন্দ এই শ্রেণীভুক্ত। বাণিনী ছন্দরীতিতে অট্‌ঠি ছন্দের ষোল অক্ষরের প্রতি পাদে একটি করে ন-গণ, জ-গণ ও ভ-গণের পর পুন এক একটি জ-গণ, র-গণ ও গুরু অক্ষর থাকে। এই ভাবে গণের ব্যবহার রীতিকেই বাণিনী ছন্দ বলে।

১২. অচ্চট্‌ঠি (অত্যষ্টি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় সতের অক্ষর বিশিষ্ট। সিখরিণী, হরিণী, মন্দক্কন্তা প্রভৃতি ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১৩. ধুতি (ধৃতি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় আঠার অক্ষর বিশিষ্ট। 'কুসুমিতলতা-বেল্লিতা' ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১৪. অতিধুতি (অতিধৃতি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় উনিশ অক্ষর বিশিষ্ট। মেগবিপ্‌ফুজ্জিতা, সদ্দূলবিক্কীলিত প্রভৃতি ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১৫. কতি (কৃতি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় কুড়ি অক্ষর বিশিষ্ট। বুত্ত বা বৃত্ত ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১৬. পকতি (প্রকৃতি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় একুশ অক্ষর বিশিষ্ট। সদ্ধরা বা স্রগ্ধরা ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

১৭. আকতি (আকৃতি) ঃ এই শ্রেণীর ছন্দের প্রতিটি পাদ হয় বাইশ অক্ষর বিশিষ্ট। মদ্দক ছন্দরীতি এই শ্রেণীভুক্ত।

২। অদ্ধসম বুত্ত

যে সকল ছন্দের প্রথম ও তৃতীয় পাদ এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদ সমান, তাকে অদ্ধসমবুত্ত (অর্ধসমবৃত্ত) ছন্দ বলে।

এ ছন্দের এমনি এক দোলা আছে যা প্রথম পাদ দ্বিতীয় পাদকে আহ্বান করে। এর মধ্যে চঞ্চল প্রবাহ রয়েছে। পঠনরীতির মধ্যেও একটি লঘু প্রবাহ বিদ্যমান। যেমন -

न জচ্চা বসলো হোতি,
ন জচ্চা হোতি ব্রাহ্মণো

কম্মনা বসলো হোতি,
কম্মনা হোতি ব্রাহ্মণো।
-(বসল সুত্তং, সুত্তপিটক)

ত্রিপিটকের ধম্মপদ, সুত্তনিপাত ও জাতকের উদান অংশে এ ছন্দের বহুল প্রয়োগ রয়েছে।

এ ছন্দ প্রধানত এগার প্রকার। যথা- ১. উপচিত্রা, ২. দুতমজ্‌ঝা, ৩. বেগবতী, ৪. ভদ্দবিরাজ, ৫. কেতুমতী, ৬. আখ্যানিকা, ৭. বিপরীতাখ্যানিকা, ৮. হরিণপ্লুতা, ৯. অপরবত্ত, ১০. পুপ্‌ফিতগ্‌গা, ১১. যবমতী।

পালি অর্ধসমবৃত্ত ছন্দের সাথে সংস্কৃত অর্ধসমবৃত্ত ছন্দের অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এমনকি রূপ ভেদের সাথেও এর কয়েকটির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।[২৯] যেমন সংস্কৃত অর্ধসমবৃত্ত ছন্দের ভেদ সমূহের মধ্যেও বেবতী, হরিণাপ্লুতা, অপরবৃত্ত (পালিতে অপরবত্ত) ও পুষ্পিতাগ্রা ইত্যাদি বিভাজন রয়েছে।[৩০]

পালি অর্ধসমবৃত্ত ছন্দের যে এগারটি ভেদ উপরে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মূলত পাদের মাত্রা, গণসমূহ ও গুরু-লঘু অক্ষর এর বিবিধ ব্যবহারের ভিত্তিতেই করা হয়েছে। ভেদগুলো আলোচনা করলেই এ বিষয়টি সহজে উপলব্ধ হবে।

১. উপচিত্রা ঃ যে শ্লোকের বিষমে (অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রতিটিতে) তিনটি স-গণ, একটি লঘু ও একটি গুরু অক্ষর থাকে এবং সমে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রতিটিতে) তিনটি ভ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে উপচিত্রা ছন্দ বলে। যেমন -

অচরিত্বা ব্রহ্মচরিয়ং অলদ্ধা যোব্বনে ধণং,
◡ ◡ –, – ◡, ◡ ◡ –, ◡ – –, – ◡ –, ◡ –
জিণ্ণকোঞ্চাব ঝায়ন্তি খীমমচ্ছেব পল্ললে।
– ◡ –, – ◡ –, – ◡ –, ◡ – ◡, – ◡ –
– ধম্মপদ (জরাবগ্‌গ), সুত্তপিটক

২. দুতমজ্‌ঝা ঃ যে শ্লোকের বিষমে (অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পাদের প্রতি পাদে)

২৯ *বাঙলা ছন্দের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ৬-৭।
৩০ নারায়ণ চন্দ্র বিশ্বাস ও ডঃ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য্য, *সংস্কৃত ছন্দ পরিচিতি*, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৩ (ভূমিকা)।

তিনটি ভ-গণের পর দু'টি গুরু অক্ষর এবং সমে (অর্থাৎ দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদের প্রতি পাদে) একটি ন-গণ, দু'টি জ-গণ ও একটি য-গণ থাকে তাকে দুতমজ্‌ঝা বা দ্রুতমধ্যা ছন্দ বলে।

৩. বেগবতী ঃ যদি সত্তিতযং গুরুযুত্তং

∪ ∪ –, ∪ ∪ –, ∪ ∪ –, –

বেগবতী যদি ভত্তিতযা-গা।

– ∪ ∪, – ∪ ∪, – ∪ ∪, – –

অর্থাৎ যে শ্লোকের বিষমে তিনটি স-গণের পর একটি গুরু অক্ষর এবং সমে তিনটি ভ-গণের পর দুটি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে বেগবতী ছন্দ বলে। উপরে উল্লিখিত বেগবতীর সংজ্ঞামূলক শ্লোকে মাত্রাচিহ্ন প্রয়োগে এর উদাহরণ প্রকাশিত হল।

৪. ভদ্দবিরাজ ঃ যে শ্লোকের বিষমে একটি করে ত-গণ, জ-গণ, র-গণ ও একটি গুরু অক্ষর এবং সমে একটি করে ম-গণ, স-গণ, জ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে ভদ্দবিরাজ (ভদ্রবিরাজ) ছন্দ বলে।

পালিতে এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে –

তো জো বিসমে রতো গুরুঞ্চে

ম-সা-জ-গা ভদ্দবিরাজমেত্থ গো চে।

৫. কেতুমতী ঃ যে শ্লোকের বিষমে একটি করে স-গণ ও জ-গণের পর পুন : একটি স-গণ ও একটি গুরু অক্ষর, ; এবং সমে একটি করে ভ-গণ, র-গণ ; ন-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে কেতুমতী ছন্দ বলে।

পালিতে কেতুমতীর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে –

বিসমে স-জা সগুরুযতা

কেতুমতী সমে ভ-র-ন গা গো।

৬. আখ্যানিকা ঃ-যে শ্লোকের বিষমে দু'টি ত-গণ, একটি জ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর, এবং সমে একটি করে জ, ও ত-গণের পর পুন: একটি জ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে আখ্যানিকা ছন্দ বলে। উদাহরণ হিসেবে আখ্যানিকা-র সংজ্ঞা প্রকাশক পালি শ্লোকটি প্রণিধানযোগ্য। যেমন –

আখ্যানিকা তা বিসমে জ-গা গো

– – ◡ – – ◡, ◡ – ◡, – –

জ - তা জ - গা গো তু সমেথ পাদে ।

◡ – ◡, – – ◡, ◡ – ◡ – –

৭। বিপরীতাখ্যানিকা ঃ এটি আখ্যানিকার বিপরীত ছন্দ। আখ্যানিকার সমপাদ ছন্দের সাথে এর বিষম পাদ এবং বিষম পাদ ছন্দের সাথে এর সম পাদ ছন্দের প্রায় সঙ্গতিপূর্ণ রূপ প্রকাশ করে।

অর্থাৎ-যে শ্লোকের বিষমে একটি করে জ-গণ ও ত-গণের পর পুন একটি জ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর এবং সমে দু'টি ত-গণ, একটি জ-গণ ও দু'টি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে বিপরীতাখ্যানিকা ছন্দ বলে।

৮. হরিণপ্লুতা ঃ যে শ্লোকের বিষমে তিনটি স-গণ, একটি লঘু ও একটি গুরু অক্ষর থাকে এবং সমে একটি ন-গণ, দু'টি ভ-গণ ও একটি র-গণ থাকে, তাকে হরিণপ্লুতা ছন্দ বলে। হরিণপ্লুতা ছন্দের সংজ্ঞা প্রকাশক পালি শ্লোকে মাত্রা-চিহ্ন প্রয়োগে এই ছন্দরীতির বিশ্লেষণ দেখানো যেতে পারে। যেমন –

স-সতো স-ল-গা বিসমে সমে

◡ ◡ –, ◡ ◡ –, ◡ ◡ –, ◡ –

নভ ভরা ভবতী হরিণপ্লুতা

◡ ◡ ◡, – ◡ ◡, – ◡ ◡, – ◡ –

৯. অপরবত্ত ঃ যে শ্লোকের বিষমে দু'টি ন-গণ, একটি র-গণ, একটি লঘু ও একটি গুরু অক্ষর, এবং সমে একটি ন-গণ, দু'টি জ-গণ ও একটি র-গণ থাকে, তাকে অপরবত্ত বা অপরবক্ত্র ছন্দ বলে।

অর্থাৎ অর্ধসমবৃত্ত ছন্দের যে শ্লোকের মাত্রারীতিতে বিষম ও সমপাদের মুখ বা সূচনা অংশ প্রায় সমান, তাকেই অপরবত্ত ছন্দ বলে।

১০. পুপ্ফিতগ্গা ঃ যে শ্লোকের বিষমে দু'টি ন-গণ, একটি র-গণ ও একটি য-গণ, এবং সমে একটি ন-গণ, দু'টি জ-গণ, একটি র-গণ ও একটি গুরু অক্ষর থাকে, তাকে পুপ্ফিতগ্গা বা পুষ্পিতাগ্রা ছন্দ বলে।

১১. যবমতী ঃ যে শ্লোকের বিষমে একটি করে র-গণ ও জ-গণ থাকে, এবং আবারও একটি করে র-গণ ও জ-গণ থাকে, এবং সমে তার বিপরীত ভাবে অর্থাৎ একটি জ-গণ ও র-গণের পর পুন: একটি করে জ-গণ, র-গণ ও পরে গুরু অক্ষর থাকে, তাকে যবমতী ছন্দ বলে।

৩। বিসমবুত্ত ছন্দ

এ ছন্দে পাদের সাথে পরবর্তী পাদের মাত্রা সমিল থাকে না, অর্থাৎ বিসমবুত্ত ছন্দে একটি ছন্দের পূর্বার্দ্ধের পর অপর যে কোন ছন্দে অপরার্দ্ধ হতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, যে শ্লোকের মধ্যে পাদের অক্ষর সংখ্যা, এবং লঘু-গুরু বিন্যাস পৃথক থাকে, তাকে বিসমবুত্ত (বিসমবৃত্ত) ছন্দ বলে। যেমন -

খন্ধ মোর পরিত্তঞ্চ আটানাটিযসুত্তকং

আকাসচ্ছদনং আসি সেসা পাকারসঞ্ঞিতা।

- (আটানাটিয় সুত্তং, সুত্তপিটক)

এই শ্লোকের পূর্বার্দ্ধের সাথে বা পূর্বপাদের সাথে পরবর্তী কোন পাদস্থিত গণের ধারাবাহিকতা বা মিল নেই।

বিস্মবুত্ত ছন্দ দশ ভাগে বিভক্ত। যথা- ১. বত্ত ২. পথ্যাবত্ত, ৩. বিপরীত পথ্যাবত্ত, ৪. চপলাবত্ত, ৫. পিঙ্গলের বিপুলা, ৬. সেতবের বিপুলা ৭. ভ-বিপুলা, ৮. র-বিপুলা, ১০. ত-বিপুলা ইত্যাদি।

এ বিভাজন গুলোতে পূর্ব ছন্দভেদ গুলোর মত বিবিধ গণের ও লঘু-গুরু অক্ষর ব্যবহারে তারতম্য উল্লেখ করা হয়েছে। নিচে এগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা হল -

১. বত্ত ঃ যে শ্লোকের আট অক্ষর বিশিষ্ট পাদসমূহের আদি ভাগে স-গণ ও ন-গণ না হয়ে উভয় পাদেই প্রথম চার মাত্রার পর য-গণ থাকে, তাকে বত্ত বা বক্ত্র ছন্দ বলে।

পালিতে বত্ত ছন্দের সংজ্ঞা প্রকাশক শ্লোকটিতেই এর উদাহরণ নিহিত। যথা -

নট্ঠ ক্খরেসু পাদেসু,

– – ◡, – ◡ –, – –

স্নাদিম্হা যোণ্ণাবা বত্তং

– – –, – ◡ –, ◡ –

২. পথ্যাবত্ত ঃ সমেসু সিন্ধু তো জেন,

◡ – ◡, – ◡ –, – –

পথ্যাবত্তং পকিত্তিতং ।

– – – –, ◡ – ◡, –

অর্থাৎ যে শ্লোকের সমপাদে চারটি বর্ণের পর জ-গণ থাকে, তাকে পথ্যাবত্ত বা পত্যাবক্ত্র ছন্দ বলে।

৩. বিপরীত পথ্যাবত্ত ঃ এই রীতি মুলত পথ্যবত্তের বিপরীত ধারার ছন্দই প্রকাশ করে। অর্থাৎ যে শ্লোকের বিষম পাদে চার মাত্রার পর জ-গণ থাকে, তাকে বিপরীত–পথ্যাবত্ত বা বিপরীত–পথ্যাবক্ত্র ছন্দ বলে।

৪. চপলাবত্ত ঃ ন কারো চে জলধিতো,

চপলাবত্ত মিচ্চেত্তং।

অর্থাৎ যে শ্লোকের বিষম পাদে চার বর্ণের পর ন–গণ থাকে, তাকে চপলাবত্ত বা চপলাবক্ত্র ছন্দ বলে।

৫. বিপুলা বা পিঙ্গলের বিপুলা ঃ

সমেলো সত্তমো যস্সা,

বিপুলা পিঙ্গলস্স সা।

অর্থাৎ যে শ্লোকের সমে বা সমপাদে সপ্তম বর্ণ লঘু হয়, তাকে পিঙ্গলের বিপুলা বলে।

৬. সেতবের বিপুলা ঃ অর্থাৎ যে শ্লোকের প্রত্যেক পাদে সপ্তম বর্ণ লঘু হয়, তাকে সেতবের বিপুলা বা শ্বেতবের বিপুলা ছন্দ বলে।

৭. ভ-বিপুলা ঃ বিসমবৃত্ত ছন্দের যে শ্লোকের প্রত্যেক পাদে চার অক্ষরের পর ভ-গণ থাকে, তাকে ভ-বিপুলা ছন্দ বলে।

৮. র-বিপুলা ঃ ভ-বিপুলা ছন্দের অনুরূপে যে শ্লোকের প্রত্যেক পাদে চার বর্ণের পর র-গণ থাকে, তাকে র-বিপুলা ছন্দ বলে।

৯. ন-বিপুলা ঃ এটিও পূর্বোক্তগুলোর অনুরূপ। অর্থাৎ যে শ্লোকের প্রত্যেক পাদে চার বর্ণের পর ন-গণ থাকে, তাকে ন-বিপুলা ছন্দ বলে।

১০. ত-বিপুলা ঃ যে শ্লোকের প্রত্যেক পাদে চার বর্ণের পর ত-গণ থাকে, তাকে ত-বিপুলা ছন্দ বলে।

পালি অক্ষর ছন্দের এই বিসমবুত্ত রূপটি সংস্কৃত বিষমবৃত্তের সাথে অনেকটা সঙ্গতি বিধান করে। সংস্কৃত বিষমবৃত্তের সংজ্ঞায়ও বলা হয়েছে ঃ "বৃত্তের চারটি পাদেরই অক্ষর সংখ্যা এবং লঘু গুরু বিন্যাস পৃথক, তার নাম বিষমবৃত্ত।"[৩১]

পালিতেও দেখা যায় বিষমবৃত্তে একটি ছন্দের প্রথম পাদের পর অপর পাদে যে কোন ছন্দ হতে পারে।

উপসংহার ঃ পালি সাহিত্যাঙ্গনে ছন্দ বর্তমানে একটি অত্যন্ত অপসৃত অধ্যায়। এ বিষয়ে পরিমিত গবেষণায় এখনো কোন গবেষকের হস্ত প্রসারণ ঘটেনি। এমন কি সাম্প্রতিকালে এ বিষয়ের ওপর কোন প্রবন্ধ নিবন্ধও লিখা হয়নি। বলতে দ্বিধা নেই যে, এটিই হয়তো প্রথম প্রয়াস। পূর্বেই উল্লেখ করেছি খ্রি. পূ. ছয় শতক হতে খ্রিস্টীয় বার শতকের মধ্যে শুধুমাত্র ছন্দের বুত্তোদয় ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থও পাওয়া যায় না। ছন্দের খণ্ডিত আলোচনা পাওয়া যায় বুত্তোদয়ের পূর্ববর্তী কালের কয়েকটি গ্রন্থে। যেমন- কচ্চায়ণ বুত্তি (মূল পরিচয়মূলক পালি ব্যাকরণ), মোগ্গলান বুত্তি, মহারূপসিদ্ধি, সদ্দনীতি, বালাবতার, মুখমত্তদীপনী ও Introduction to Pali (Oxford) প্রভৃতি। কিন্তু আজকাল এ গ্রন্থগুলো দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য। বর্তমানে এগুলোর দু একটি বই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। এটি অত্যন্ত সুখের কথা। কিন্তু পালি ছন্দ

৩১ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬ (ভূমিকা)।

ও অলঙ্কারের আলোচনায় তা যথেষ্ট নয়। যে কারণে উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আজও পালি ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্রের অভাব পূরণ হয়নি।

আশা করি ভবিষ্যতে পালি ছন্দের আলোচনা গবেষণা প্রসার লাভ করবে এবং সংস্কৃত, বাংলা ও পালির মধ্যে তুলনামূলক শাস্ত্রীয় বিষয়াদির চর্চাও বহুলভাবে বৃদ্ধি পাবে। এতে আরও বহু নতুন বিষয়ের উদ্ভব হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এমনকি চর্যাপদ-এর সিদ্ধাচার্যদের চর্যার পদ বিনির্মাণে পালি অলঙ্কার শাস্ত্র ও ছন্দের ভূমিকাও উন্মোচিত হতে পারে বলে আমরা আশাবাদ ব্যক্ত করি।